তিনি একজন সব্যসাচী

কাইউম পারভেজ

তিনি কবি, তিনি লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, তিনি গল্পকার, তিনি সফল উপস্থাপক কী নন তিনি? সে কারণেই তো তিনি সব্যসাচী। সংসদ বাংলা অভিধান অনুযায়ী বাম ও দক্ষিণ উভয় হাতেই যিনি শরচালনায় সমর্থ - তিনিই সব্যসাচী। সৈয়দ শামসুল হক তীর চালাননি চালিয়েছিলেন কলম। তিনি বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য লেখক এবং সংস্কৃতি সেবক। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, চিত্রনাট্য তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাঁকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়। গত চারদশকেরও অধিক কাল জুড়ে তিনি এই অভিধায় অভিহিত। কে কখন কোথায় এই অভিধা তাঁকে দিয়েছিলো, তা জানা নেই কিন্তু এই অভিধার প্রতি নীরব সমর্থন জানিয়ে রেখেছেন তাঁর সময়ের বাংলা ভাষাভাষী সকল লেখক ও পাঠকসমাজ।

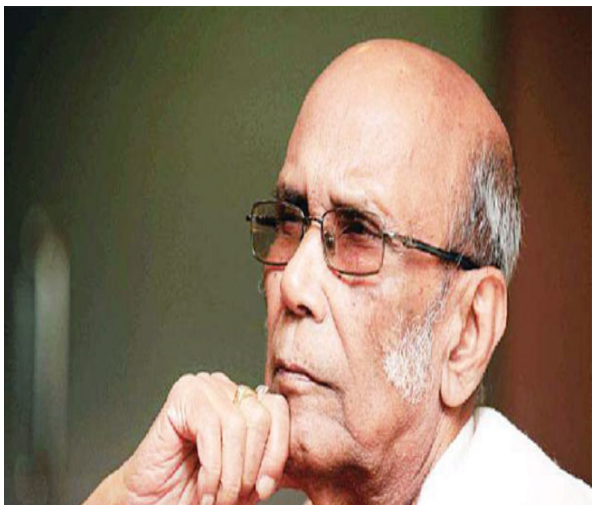

কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্রসহ সাহিত্যের সব শাখায় স্বচ্ছন্দ্য সৈয়দ হক ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আর গত মঙ্গলবার ২৭ সেপ্টেম্বর (২০১৬) ফুসফুসের ক্যান্সার জটিলতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

সেই ১৯৫৪ সালে 'তাস' শীর্ষক গল্পগ্রন্থ দিয়ে তার প্রকাশনা শুরু, তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ নানান পুরস্কার পাওয়া এই সাহিত্যিকের হাত দিয়ে 'খেলারাম খেলে যা', 'নীল দংশন', 'মৃগয়া', 'সীমানা ছাড়িয়ে', 'আয়না বিবির পালা'সহ বহু পাঠকপ্রিয় বই এসেছে।

তার লেখা নাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'নুরলদীনের সারাজীবন' বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে।

তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা 'বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা' এক অনবদ্য সৃষ্টি। দেশ, ইতিহাস, ব্যক্তিমানুষ ও জাতিমানুষের এক বিশেষ সম্বন্নয়ে এমন সাহসী ও শৈল্পিক দলিল সহজে দেখা যায় না। যদি ধরে নেই 'খেলারাম খেলে যা','সীমানা ছাড়িয়ে','বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা', "আমার পরিচয়", 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'নুরলদীনের সারাজীবন' ছাড়া তিনি আর কিছুই লেখেননি তা'হলেও বলবো তাঁকে স্মরণ করার জন্য আমাদের যথেষ্টই তিনি দিয়ে গেছেন।

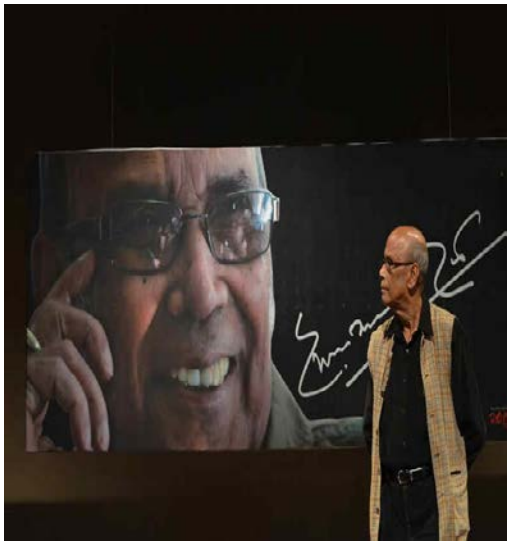

কবি নুরুল হুদা লিখেছেন - "আট সন্তানের মধ্যে প্রথম, পিতা সদৃশবিধানসম্মত চিকিৎসক, মাতা সনাতন বাংলার এক পল্লীজননী। শৈশবে গ্রামের স্কুলে পাঠগ্রহণকালে রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের ছোট নদী' পড়েই পদ মেলানোর নেশায় মেতে ওঠেন। তারপর এগারো-বারো বছর বয়সে বাড়ির রান্নাঘরের পাশে সজনে গাছে দু'টি লাল টুকটুকে পাখি দেখে দু'লাইনের একটি পদ মেলালেন মুক্তক সাধু গদ্যবয়ানে, 'আমার ঘরে জানালার পাশে গাছ রহিয়াছে / তাহার উপরে দুটি লাল পাখি বসিয়া আছে'। পড়েই বোঝা যায়, এই বর্ণনায় একটি ব্যতিক্রমী চিত্রকল্প আছে যেখানে 'লাল' শব্দটির ব্যবহার নিরীক্ষাপ্রবণ। ফলে এই বয়ানপঙক্তির স্রষ্টা যে কালে কালে বাংলা ভাষায় একজন আপন মুদ্রাধারী সাহিত্যস্রষ্টা হবেন এমনটি আঁচ করা যায়। এই নিরীক্ষামানুষ আর কেউ নন,

আমাদের কালের বহুমাত্রিক শীর্ষ সাহিত্যস্রষ্টা সৈয়দ শামসুল হক। আমরা তাঁকে বলি সব্যসাচী।"
তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন তিনি কে কী তাঁর পরিচয়। তাঁর অন্তরে কী তিনি ধারণ করেন। কোথায় তাঁর দুঃখ কোথায় তাঁর সুখ:

আমি জন্মেছি বাংলায়
আমি বাংলায় কথা বলি।
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে ?
আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তে বিদ্রোহী গ্রাম থেকে
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।
এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।
আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারোভূঁইয়ার থেকে
আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি' 'মহুয়ার পালা' থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।
এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনের থেকে
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।
আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে
শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে ?
তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই-
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।
পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের-
কখনোই ভয় করিনাকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রের শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপোষ করিনি কখনোই আমি- এই হ'লো ইতিহাস।
এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান ?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তারই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি-
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস পায়ে উর্বর পলি।
(আমার পরিচয়)

এক সাক্ষাৎকারে সৈয়দ হক বলেছেন - আমার জীবনে একটাই অতৃপ্তি, কেন যে কণ্ঠে গান তুলে নিলাম না। তা'হলে কবিতার হাত দিয়ে সুর ও বাণীসহযোগে শ্রোতাদের কিছু শ্রুতিমধুর গান দিতে পারতাম'। তথাপি তাঁর লেখা অসংখ্য গান দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে।

কবি বলেন আমি কখনো গান লিখতে চাইনি। প্রথম গান লিখতে হয়েছিল প্রডাকশনের খরচ বাঁচাতে এবং সুরকার সত্য সাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সত্যিকার অর্থে একজন লিখছেন, একজন সুর করছেন। এটা আমার পছন্দ নয়। এতে সুর ও কথার বিচ্যুতি ঘটে। একজনই এই দুটো কাজ করলে অসাধারণ কিছু সৃষ্টি হয় বলেই আমার বিশ্বাস। এ কারণে আমি গানটা লিখেছি বটে, কিন্তু মন কখনো সায় দেয়নি।

আমার লেখা প্রথম গান ছিল সুতরাং ছবির 'তুমি আসবে বলে, কাছে ডাকবে বলে, ভালোবাসবে বলে শুধু মোরে'। এই ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং সবগুলো গান আমার লেখা। প্রথম গানটি লিখেছিলাম ফরাশগঞ্জে একটি বাড়ির চিলেকোঠায় বসে ১৯৬১ সালে। সেখানে একটি মেসে থাকতেন সত্য সাহা। গানটি একসঙ্গে বসেই করা। আমি এক লাইন লিখেছি, আর সত্য সেটা সুর করেছেন। এভাবেই তৈরি হয় গানটি। (এখানে একটু ব্রেক দিলাম একটি ঘটনা বলবার জন্যে। লন্ডন থেকে ফিরে হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার পর কবি সব সময় হাসিখুশী থাকবার চেষ্টা করতেন। সবাইকে বলতেন - আগামী ২০২২ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। আমি

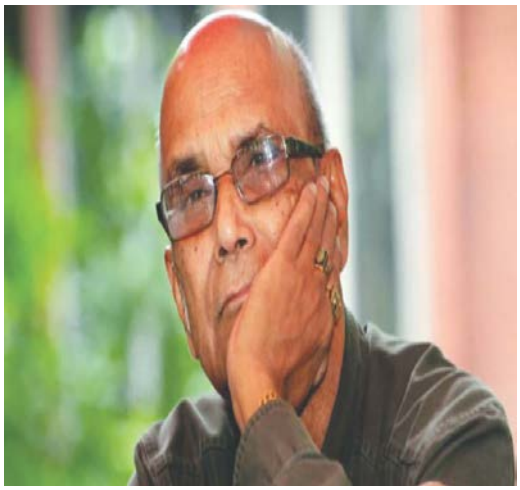

ততদিন বাঁচতে চাই সেই উৎসবটা পালন করার জন্য। আমি এখন লিখে যাচ্ছি। শরীর দিলেই আমি লিখছি। তো একদিন চিত্র নায়িকা কবরী এলেন তাঁকে দেখতে। তিনি যখন জানলেন কবরী এসেছেন তখন কেবিনে শুয়ে গান ধরলেন- 'পরাণে দোলা দিলো এ কোন ভ্রমরা'। এই গান যখন কবরীর কানে এলো তিনি তখন গাইতে শুরু করলেন 'তুমি আসবে বলে ভাল বাসবে বলে কাছে ডাকবে ওগো শুধু মোরে..।' দুটো গানই সব্যসাচীর লেখা) এ ছাড়া আব্দুল আলীম আর কাজী আনোয়ার হোসেন গেয়েছিলেন 'এই যে আকাশ, এই যে বাতাস, বউ কথা কও সুরে যেন ভেসে যায়, আরেকটি গান 'এমন মজা হয় না, গায়ে সোনার গয়না, বুবুমণির বিয়ে হবে বাজবে কত বাজনা'। গেয়েছিল শিশুশিল্পী আলেয়া শরাফী। দিনের পর দিন ওই মেসে বসেই গানগুলো লেখা। ছবির সবগুলো গানই শ্রোতাপ্রিয় হয়েছিল।

সুভাষ দত্তের আরেকটি ছবি আয়না ও অবশিষ্ট। আমার লেখা এই ছবির 'যার ছায়া পড়েছে মনেরও আয়নাতে, সে কি তুমি নও ওগো তুমি নও' ফেরদৌসী রহমানের গাওয়া এই গানটি ওই সময় ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল। সুর করেছিলেন সত্য সাহা।

সত্য সাহার পর আমি হাতেগোনা কজন সুরকারের সঙ্গে কাজ করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল আহাদ, সমর দাস, আলম খান, বশীর আহমেদ। কাজী জহিরের ময়নামতি ছবিতে বশীর আহমেদের সুর ও কণ্ঠে আমার লেখা একটি গান বেশ আলোচিত হয়। গানটি ছিল 'অনেক সাধের ময়না আমার বাঁধন কেটে যায়, মিছে তারে শিকল দিলাম রাঙা দুটি পায়'। মনে পড়ে, গানটি কাজী জহিরের গ্রিনরোডের বাসায় বসে লিখেছিলাম। তাঁর একটা কায়দা ছিল, সুরকারদের তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সামনে বসে সুর করতে হতো। সুর পছন্দ হলে তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়তেন। আর পছন্দ না হলে দাঁড়িয়ে যেতেন।

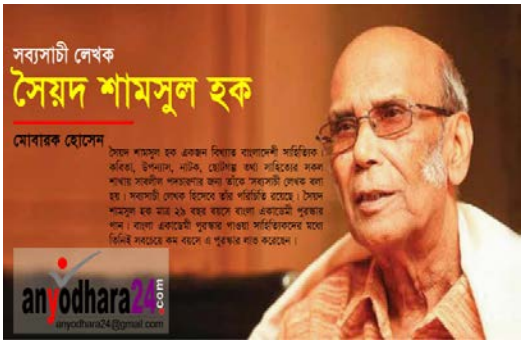

আলমের সঙ্গে আমার আরও দুটো গান করা হয়েছিল। এই দুটো গানও ভীষণ জনপ্রিয় হয়। একটি মান সম্মান ছবির 'কারে বলে ভালোবাসা কারে বলে প্রেম, মিলনে বিরহে আমি জানলেম'-এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া। অন্যটি আশীর্বাদ ছবির 'চাঁদের সঙ্গে আমি দেব না তোমার তুলনা'। গেয়েছিলেন রুনা লায়লা ও এন্ড্রু কিশোর। চলচ্চিত্রের জন্য এটাই ছিল আমার লেখা শেষ গান। এরপর আমি আর কোনো গান লিখিনি।"

কথাটা সব্যসাচী সঠিক বলেননি। অথবা তখনো তিনি জানতেন না তিনি আবার গান লিখবেন। অসুস্থ হবার পর যখন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি চলে যাচ্ছেন তখন সকলের অনুপ্রেরনায় তিনি দু'হাতে সাধ্যের অনুকূলে লিখে যাচ্ছেন।

গত শনিবার ২৪ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র 'ছুটির দিনে' তাঁকে নিয়ে 'তিনি যদি আরও কয়েকটা গান দিয়ে যান...' শিরোনামে সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। সেই লেখায় এন্ড্রু কিশোর যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, দিন না পেরোতেই তা পূরণ হয়ে যায়। রোববার সন্ধ্যায় অসুস্থ কবিকে দেখতে গেলে সৈয়দ হক তাঁকে নতুন চারটি গান উপহার দেন। হাসপাতালে সৈয়দ শামসুল হকের মুখোমুখি হতেই তিনি এন্ড্রু কিশোরকে ইশারায় কাছে ডাকেন। কবির স্ত্রী আনোয়ারা সৈয়দ হকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সৈয়দ হকের পাশে গিয়ে দাঁড়ান এন্ড্রু কিশোর। এরপর সব্যসাচী লেখক এন্ড্রু কিশোরকে চার লাইন গান গাইতে বলেন। শিল্পী তখন 'হায় রে মানুষ রঙিন ফানুস' আর 'চাঁদের সাথে আমি দেব না তোমার তুলনা' গান দুটি গেয়ে শোনান। (এ গান দুটিও সৈয়দ হকের লেখা)

এরপরের ঘটনা বর্ণনা করে এন্ড্রু কিশোর বলেন, 'বিদায় নেব, সে সময় আবার হক ভাই ডাকলেন। বললেন, "এই শরীর খারাপ অবস্থায় হাসপাতালে বসে আমি চারটা গান লিখেছি। চারটা গান তোমাকেই দিতে চাই।" আমি সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ খুশি হয়ে যাই। বললাম, আমি নাহয় গাইব, কিন্তু গানগুলোর সুর করবে কে?'

হক ভাই জবাব দিলেন, 'কে আবার, আলম। আলম খান।' (অত্যন্ত দুঃখজনক আলম খান সে রোববারেই ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন।)

হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার পর কবি শিল্পী সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ নেতা নেত্রী সকলেই গেছেন তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে একনজর দেখতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও গেছেন দু'বার। একবার বাসায় একবার হাসপাতালে। লন্ডন থেকে চিকিৎসায় বিফল মনরথে দেশে ফিরে এলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিকিৎসার সব দায়িত্ব নেন। লন্ডন সৈয়দ হকের পুরনো শহর। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি লন্ডনে গিয়ে বিবিসি রেডিওতে যোগদেন। খবর পড়া ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের উপর নানান অনুষ্ঠান তৈরীতে লেগে পড়েন। খন্ড খন্ড নাটক তৈরী করে প্রচার করেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে। সেখান থেকেই তাঁর আগ্রহের সৃষ্টি হয় নাটক নিয়ে কাজ করতে।

আগেই উল্লেখ করেছি সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ সালে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসুস্থ হবার কিছুকাল আগে কুড়িগ্রামে তিনি গিয়েছিলেন তাঁকে দেয়া এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। সেখানেই তিনি বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে যেন এই কুড়িগ্রামেই দাফন করা হয়। স্কুলের পাশে সে স্থানটিও তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হলো। নিজের দেশ নিজের জন্মস্থানকে তিনি কত যে ভালবাসতেন তা যেমন পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর লেখায় এবং সেটা তিনি ধারণ করতেন তাঁর বিশ্বাসে, মননে।

সৈয়দ হকের মৃত্যুতে শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠেয় শেখ হাসিনার ৭০তম জন্মদিন উদযাপন আয়োজনটি স্থগিত করেছে আয়োজক কমিটি যার আহ্বায়ক করা হয়েছিল সৈয়দ শামসুল হককে। এ উপলক্ষে তিনি একটা কবিতাও লিখেছিলেন:

আহা, আজ কী আনন্দ অপার!

আহা, আজ কী আনন্দ অপার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার

জয় জয় জয় জয় বাংলার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তাঁর
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
পঁচাত্তরের কলঙ্কিত সেই রাত্রির পর
নৌকা ডোবে নদীর জলে
সবাই বলে নৌকা তুলে ধর
কেইবা তোলে কে আসে আর
স্বপ্নবাহু তাঁর
বঙ্গবন্ধু কন্যার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার

শেখ হাসিনা সব নদীতে
দুর্জয় গতিতে
টেনে তোলেন নৌকা আনেন উন্নয়ন জোয়ার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার

জাতির পিতার রক্তে দেশ
এখনও যায় ভেসে
সেই রক্তের পরশ মেখে দেশ উঠেছে জেগে
এ দেশ তোমার আমার
জয় জয় জয় জয় বাংলার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তাঁর
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
আহা, আজ কী আনন্দ অপার!

আশিটি বছর একজন মানুষের জন্য অনেক সময়- অনেক দীর্ঘ পথ। এ দীর্ঘ পথে অনেক হয়েছে দেয়া নেয়া। তিনি দিয়েছেন হতাশায় আশা, অনিশ্চিতের মাঝে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন যখন মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। নিয়েছেন অগণিত মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, অশ্রু আর ভাললাগা। সক্কলকে বলেছিলেন:

আমি একটুখানি দাঁড়াব এবং দাঁড়িয়ে চলে যাব
শুধু একটু থেমেই আমি আবার এগিয়ে যাব
না, আমি থেকে যেতে আসিনি
এ আমার গন্তব্য নয়
আমি এই একটুখানি দাঁড়িয়েই
এখান থেকে
চলে যাব।
(আমি একটুখানি দাঁড়াবো)

অতঃপর তিনি চলেই গেলেন।